TJ BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION
অফিস : পরাণপুর, রতুয়া, মালদা
পরিষেবা
ফ্লোর প্ল্যান | 3D ডিজাইন | স্ট্রাকচারাল | আর্কিটেকচারাল | ইন্টেরিয়র | ইস্টিমেশন | সয়েল টেস্ট | সার্ভে | অনুমোদন | সাইট সুপারভিশন
আপনার স্বপ্নের বাড়ি গড়ার বিশ্বস্ত সঙ্গী!
9591 475600

ই-জার্নাল
গবেষণাধর্মী পত্রিকা
সাহিত্যসেনা

ই-জার্নাল সাহিত্যসেনা
আবার নতুন রূপে নতুন পথে নতুন ভাবনায় ফিরে এসেছে। লেখা পাঠান টাইপ করে Mail ID তে।
Mail
sahityasena@gmail.com
Whatsapp
8617377896

Volume No : 01, Issue No : 01, Sahityasena Journal, April : 2026, E-mail: sahityasena@gmail.com, Website : www.sahityasena.com

সম্পাদকীয়

সরিফুল ইসলাম

২০০৬ সালে সাহিত্যসেনার পথ চলা শুরু হয়েছিল অফলাইনে, সাহিত্যকেন্দ্রিক মনোযোগ নিয়ে–সৃজনশীল রচনা ও সমালোচনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। অনলাইন প্রকাশনার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে, যা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সংযোগকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিফলিত করে। সাহিত্যসেনার মতো একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা কেবল সাহিত্যিক সৃজনশীলতার সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি স্বভাবতই নানা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

আমরা সহিত্যসেনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করছি, একে বিভিন্ন একাডেমিক শাস্ত্রের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করে। বাংলা ও ইংরেজি–দুই ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা আন্তঃবিষয়ক সংলাপকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি, যাতে এটি বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই রূপান্তর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে, যেখানে সহিত্যসেনা সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের সংযোগস্থল অন্বেষণ করে, জ্ঞানের বিনিময় ও সূক্ষ্ম বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা গবেষকদের আহ্বান জানাই নানা বিষয় নিয়ে যুক্ত হতে, ভাষা ও শাস্ত্রের সেতুবন্ধন ঘটাতে। সহিত্যসেনার এই বিকাশ আমাদের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান ও বিনিময়ের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ায় আমাদের মূল লক্ষ্য।

প্রসঙ্গে প্রথমেই নাটক নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে।
নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অসুবিধা, সাধারণ মানুষের কাছে আজও নাটকপাঠ সমাদর লাভ করেনি (সাধারণ মানুষের দিকে আঙুল দেখাবার আগে একটু নিজেদের দিকে ও লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরাই বা নাটকপাঠে কতটা আগ্রহী?)।তুলনায় ছোটগল্প কবিতা উপন্যাস এবং প্রবন্ধ পাঠের অভ্যাস সাধারণ পাঠকের মধ্যে অনেক বেশি সহজলভ্য।

সাহিত্যসেনা পত্রিকার পিয়ার রিভিউ কমিটির সদস্যবর্গ :
১) ড. পবিত্র সরকার, বিশিষ্ট ভাষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
২) ড. দীপককুমার রায়, উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।
৩) কবি কমল দে সিকদার, সভাপতি লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম, কলকাতা, অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার,রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ।
৪) ড. মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। প্রাক্তন ডিন, মানবিক বিদ্যা ও ভাষা অনুষদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
৫) ড. উৎপল মন্ডল, অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
৬) ড. দিলীপ দেবনাথ, অধ্যাপক, রসায়ন, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭) ড. প্রদীপ চৌহান, অধ্যাপক, ভূগোল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) ড. সনাতন দাস, অধ্যাপক, অঙ্ক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড টপ টু-পারসেন্ট সাইন্টিস্ট।
৯) ড. মৃণালচন্দ্র দাস, সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
১০) ড. মোহাম্মদ আব্দুল অহাব, ইংরেজি, অধ্যক্ষ, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।
১১) ড. সলিলকুমার মুখার্জি, অধ্যক্ষ, কমার্স, সামসি কলেজ, মালদা।
১২) ড. ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,

নাট্যকলার সন্ধানে

ড. মনোজ ভোজ

নাট্যকলার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, নাট্যনির্মিতির মূলে থাকে এক সুখকর বেদনার ইতিহাস। সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের 'চিঠি' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি মনে পড়ে যায়, "তুমি আমার/ কষ্ট হয়ে/ বাড়ালে সুখ/ এত সুখের/ কষ্ট আমি/ কাকে জানাই"। নাট্যনির্মিতির জন্য একদিন দু'দিন শ্রম বা নিষ্ঠা দিলেই হয় না, আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি সফল নাট্য। সফলতার মাপকাঠি কী তা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় অবিতর্কিত--- নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁরা নানা প্রতিবন্ধকতা এবং সুখকর কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করেন। সেই দিনযাপনের কতটুকুইবা আমরা জানতে পারি। ভাসা-ভাসা কিছু বিষয় আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় মাত্র।

(১)

নাট্যনির্মিতির প্রথম পর্বেই রয়েছে নাটক। লিখিত নাটক একসময় প্রয়োজন হ'ত না। মুখে মুখেই সবটুকু বানিয়ে অভিনয় করেছেন শিল্পিরা। লিখিত নাটক

ফলে নাটক মানুষ দেখতে আসেন। নাটকপাঠের অভ্যাস দর্শক ও নির্মাতার মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি করে, আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা নির্মাতার কাজের সদিচ্ছাকে সমৃদ্ধ করে। তবে নাটকপাঠের অভ্যাসহীন দর্শকের ক্ষেত্রে সুবিধা যে নেই তা নয়, তাদেরকে কল্পনা রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। আগে থেকে নাটকটি সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনেক বেশি থাকে। এমন স্বাধীনতা কি কাম্য? প্রত্যেক নির্মাতাই চান ভালো দর্শক, যে দর্শক সংবেদনশীল, নাট্য ও নাটক সম্পর্কে পূর্ব থেকেই প্রাজ্ঞ, সেই দর্শক যিনি আমার ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন, আমাকে সমৃদ্ধ করবেন, এগিয়ে দেবেন। কখনো কখনো ছোটগল্প বা উপন্যাস ইত্যাদির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হলে সেখানে নাটকটির কথাবস্তু সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলেও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা দর্শকদের অভিনব ভাবজগতে পৌঁছে দেয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি যখন মঞ্চে উপস্থাপন করা হয় তখন তার মাত্রা যায় বদলে। পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাস নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ আজও বেশ ভালই জনপ্রিয়। সে ক্ষেত্রে নির্দেশক বা অভিনেতাদের একটা চ্যালেঞ্জ থাকে উপন্যাসকে উত্তীর্ণ ক'রে নতুন জগতে পৌঁছে দেবার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাপ্পাদিত্য' কাহিনিটি প্রায় সব বাঙালি পাঠ করেছেন এবং একটি নিজস্ব কল্পনা জগৎ রচনা করেছেন এই কাহিনি নিয়ে, কিন্তু সেই কাহিনি যখন নান্দীকার মঞ্চস্থ করে তখন চিন্তা করতে হয়, বাঙালির এতদিনের লালিত কল্পনাকে কীভাবে উত্তীর্ণ করা যাবে। কীভাবে উসকে দেওয়া যাবে কাহিনিটি পাঠের মধুর স্মৃতিকে।

আবার একই নাটক যখন বহু মঞ্চে অভিনীত হয়, তখন পূর্বের প্রযোজনাকে উত্তীর্ণ করে যাওয়ার মানসিকতা পরবর্তী নাট্যদলটির থাকে। অবশ্য কোনো কোনো নাটক গ্রামে গঞ্জে প্রচুর পরিমাণে হলেও পরবর্তী নাট্যদলের ক্ষেত্রে সেইসব প্রযোজনা দেখা নাও থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে শিল্পি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ, স্থান ও সময়ের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই অভিনব হয়ে ওঠে নাট্যটির নির্মাণকলা। এ তো তাঁর নিজস্ব দর্শনের সঙ্গে নাটকের কথাবস্তু সংযুক্ত হয়ে নতুন একটি ভাবনার নির্মাণ, যা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতায় আরো বেশি শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার, নাটককার নাটক লিখে দেন; পরিচালক সেই নাটকটি দ্বিতীয়বার লেখেন, তাঁর মনের মতো ক'রে সাজিয়ে নেন। মহড়া চলাকালীন তৃতীয়বার লেখা হয়, মহড়া চলতে চলতে কত নতুন ভাবনা জন্ম নেয় নাটকটিকে কেন্দ্র করে, যার ফলে নাটকটির জন্মান্তর ঘটে বারবার।

ইতিপুর্বে জানিয়েছি নাট্যপাঠের অভ্যাসের কথা। অভ্যাসটি ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে বলে নাটক প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রকাশনাগুলির অনীহা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে ভালো নাটক থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। বিশেষ কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা নাটক প্রকাশ করেন এবং অবশ্যই সেই নাটকগুলি হয় বিখ্যাত নাটককারের রচিত নাটক। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ, বিহার, ঝারখণ্ড, এমনকি বিদেশেও বসে যে সকল বাঙালি নাটক লিখছেন তার হদিস আমরা কতটুকুই বা রাখি। সেই নাটকগুলি এক বা একাধিকবার মঞ্চস্থ হওয়ার পর নাটককার বা নাট্যদলের ট্রাঙ্কে অনাদরে পড়ে থাকে।

নাট্যদলগুলির নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন,---

১. মৌলিক নাটক। (ক) সমকালীন সমাজের প্রয়োজনে সমসাময়িক নাটককারের লেখা নাটক এবং (খ) পুরনো নাটক সমকালের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে করবার জন্য নির্বাচন করা হয়। ইফটা নাট্যদলের 'বুড়ো শালিক নট আউট' এমনই একটি নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। নির্মাতা নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে।২. রূপান্তরিত নাটক (ক) হুবহু তর্জমা (খ) বাঙলার উপযোগী করে ভাবানুবাদ (গ) হুবহু তর্জমা, অথচ বাঙলার জীবনচর্চার সঙ্গে মিশিয়ে গড়ে তোলা (ঘ) কথাসাহিত্য বা অন্যান্য সাহিত্যের নাট্যরূপ।

৩. দলগত কারণেও নাটক নির্বাচিত হয়। (ক) দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দক্ষতা ও অক্ষমতা একটি বিশেষ কারণ। কোন দলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সঙ্গীত বা নৃত্যদক্ষ শিল্পি থাকলে তাদের দলের নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্যের বাহুল্য দেখা যায়।যদিও নৃত্য ও সঙ্গীতবাহুল্য থাকা মানেই এই কারণটি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা নয়। বিশেষ কোন নাটক মঞ্চস্থ করবার কথা ভাবলে, সেখানে সঙ্গীত বা নৃত্যের জন্য অন্য দল থেকে বা বাইরে থেকে শিল্পি আনা হয়। এসব ক্ষেত্রে সমবেত প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।(খ) নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত নাটক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। একসময় পাড়ায় পাড়ায় গ্রামেগঞ্জে গড়ে ওঠা সখের নাট্যদলগুলিতে অভিনেত্রী পাওয়া যেত না বলে বহু নাটকের টাইটেল পেজেই লেখা থাকতো "নারী বর্জিত নাটক"। আবার পুরুষ বর্জিত নাটকও দেখা গেছে অর্থাৎ কোনো গার্লস কলেজ বা লেডিস হোস্টেলের উপযোগী করে নাটক রচনাও দুর্লভ ছিল না। এছাড়া যে সকল নাট্যদলে

সংখ্যা বেশি থাকে নাটকটি হয় নারীকেন্দ্রিক, আবার পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকলে পুরুষকেন্দ্রিক নাটক নির্বাচন করা হয় দলে। (গ) শিল্পের যে শাখায় পরিচালক সর্বাধিক আগ্রহ বোধ করেন সেই শাখার প্রভাব নাট্যে বিশেষ ভাবে থাকে। বালুরঘাট নাট্যকর্মীর পরিচালক অমিত দাস জানান, তিনি নাটকে আলোর প্রয়োগ বেশি পছন্দ করেন। কেউবা মঞ্চপরিকল্পনার উপর জোর দেন, আবার কেউ মিউজিককে নানা ভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা রাখেন নাট্যের ক্ষেত্রে।

(ঘ) কোন নাট্যদলের কর্ণধার বা পরিচালক স্বয়ং নাটককার হলে তাঁর রচিত নাটকই সেই দলে প্রযোজনা হয়ে থাকে। (ঙ) নাট্যদলের আর্থিক ক্ষমতাও নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। নাটকে অঙ্গসজ্জা মঞ্চব্যবস্থা আলোকভাবনার ইত্যাদি যখন খুব সাধারণ খরচে সম্ভব হয় কোন নাটকে, সেই নাটক আর্থিক ভাবে দুর্বল দলগুলি বেশি বেশি করে মঞ্চস্থ করে। স্পষ্টভাবে বলা যায়, আর্থিক সঙ্গতি কম থাকার কারণে বহু নাট্যদল ছোট নাটক পরিবেশন করে। এবং তারা যেহেতু কল শো ছাড়া নিজস্ব শো করবার ক্ষমতায় রাখে না সেহেতু নাট্যদলগুলি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রচেষ্টা পায়।

৪. মঞ্চের কারণে নাটক নির্বাচনের ভাবনা পাল্টে যায়। যেমন প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য এক ধরনের নাটক, পথনাট্যের জন্য আর এক ধরনের নাটক, আবার অন্তরঙ্গ থিয়েটার হলে সেখানে ভিন্নমাত্রিক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। তবে কোনো কোনো নাটক অন্তরঙ্গ থিয়েটারে যেমন, তেমনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেও অভিনীত হতে দেখা গেছে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো বাদল সরকারের 'মিছিল'।

(২)

নাট্যে পৌঁছতে গেলে দ্বিতীয় উপাদান নাট্যদলের কুশীলব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা আসেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যাঁদের অনেকের মনে থাকে সমাজ বদলের ভাবনা, আবার একই সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কীভাবে হবেন তাঁরা? থিয়েটার করে জীবিকা অর্জন করা খুব কঠিন ব্যাপার। ফলে ভিন্ন একটি জীবিকা এবং সঙ্গে যুক্ত নাট্যে। জীবিকার জন্যে নাট্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কেউ কেউ নাট্যের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়কে ভালোবেসেই হোক বা জীবিকার প্রয়োজনেই হোক ধারাবাহিক চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে যাবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তা হ'ল নাট্যদলগুলি রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। তবু এরই মধ্যে দল চলে। অতিথি হিসেবে কিংবা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বাইরের শিল্পীদের নিয়ে এসেও নানা প্রযোজনার চেষ্টা চলে। যে করেই হোক দলটিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়। অভিনয়কে ভালোবাসা, দলের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা এবং অভিনয়কে সাধনা হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জন, এইসব মিলিয়ে তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো ক্লান্তি তো আসেই। আর সেই কারণেই নাট্যে চমক দেওয়ার চেষ্টা কিংবা নাট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। নাট্যে পৌঁছানোর আগেই কেউ কেউ মঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

বারবার নাট্যসাধনা শব্দবন্ধটি আমরা ব্যবহার করেছি, কিন্তু কী সেই নাট্য সাধনা, নাট্য সাধনা আর নাট্য প্রতিভা এই দুইয়ের সম্পর্ক কী--- এই নিয়ে নানা আলোচনা হতে পারে। তবে খুব সংক্ষেপে এ' কথা সত্য, অনেকেই নাট্যপ্রতিভা নিয়ে জন্ম নেন, যারা খুব সহজে সৃষ্টি করতে পারেন অনবদ্য সমস্ত শিল্পকলা, কিন্তু নাট্যসাধনার সঙ্গে নাট্য প্রতিভার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। নাট্যপ্রতিভা আবার সাধনার মধ্য দিয়ে উন্নত হয়ে ওঠে। অনেকের কাছে নাট্যপ্রতিভা গুরুত্ব পায় না। তাঁরা সাধনার মধ্য দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারেন।

এর জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে গুরুবিদ্যা, দ্বিতীয়ত নিরন্তর চর্চা, তৃতীয়তঃ সব ছেড়ে কেবল প্রাণের দেবতাটিকে নাট্যশিল্প নিয়ে প্রশ্ন করা, আমি কতটা এগোতে পারলাম প্রতিদিন। আগের দিনের চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারলাম কতটা, তার হিসেবে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা। এ তো গেল একক সাধনার প্রয়াস। এখন নাট্যদলগুলি অনেক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই আমাদের সঞ্চিত হয়। তারপর সেই কর্মশালা শেষ হলে সঞ্চিত ধন কখন যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় কেবলমাত্র চর্চার অভাবে। তাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কর্মশালায় যোগদান করলেই হয় না, তাকে প্রতিনিয়ত জীবনের অঙ্গ করে তুলতে হয়।

নাট্য শিল্পে পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মঞ্চ। মঞ্চ বলতে একটি বিশেষ স্থানের কথাই আমরা বুঝি। সেই স্থানটি কোথায় এবং কেমন হবে। সাধারণভাবে যুগ যুগান্তর ধরে পথে-প্রান্তরে যে নাট্য অভিনীত হয়ে চলেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যায় যে মানুষের সমান্তরাল ভূমিতে অভিনয় করতেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ। আরও পরে প্রসেনিয়াম মঞ্চের আবির্ভাব। তবে তারও সময় অল্প দিনের নয়, ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্রে মঞ্চপরিকল্পনার যে কথা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় এই ধারার মঞ্চ বিদেশ থেকে আমদানি নয়, আমরা স্বদেশেই লাভ করেছিলাম। ভরত মুনি তিন ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, বিকৃষ্ট, ত্র্যস্র ও চতুরাস্র। এই তিন শ্রেণীর নাট্যমঞ্চ আবার পরিমাপ অনুযায়ী তিন ধরনের ছিল। চতুরাস্রর সর্বাধিক বড় মাপ ৬৪ x ৬৪ বর্গহাত, পরের দুটি মাপ ৩২ x ৩২ বর্গহাত, ১৬ x ১৬ বর্গহাত। বিকৃষ্ট মঞ্চের পরিমাপ একই ভাবে ১০৮ x ৬৪ বর্গহাত, পরের দুটি মাপ ৬৪ x ৩২ বর্গহাত, ৩২ x ১৬ বর্গহাত। ত্র্যস্র ত্রিভুজ আকৃতির। এর প্রতিটি বাহুর মাপ ১০৮ হাত এবং পরবর্তী দুটি পরিমাপের ত্র্যস্র হল ৬৪ ও ৩২ হাত। প্রতিটি থিয়েটারকে দু'ভাগে ভাগ করা হত। এক ভাগে অভিনয়ের ব্যাপারগুলি মিটতো, অন্য ভাগে দর্শক আসন ছিল। একথা স্বীকার করতেই হয় আমাদের দেশে এক দিক খোলা তিনদিক বন্ধ মঞ্চ, যাকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার হিসেবে বর্তমানে বলা হয় তার অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে বাঙলায় সেই মঞ্চের কোনো হদিস না পেলেও আমরা বাঙলার নাটকের হদিস পেয়েছি। চর্যাপদে, 'বুদ্ধনাটক' অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন নাট্যমঞ্চ ছিল কিন্তু তার চেহারা কেমন ছিল, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। পথনাটকের ও অন্তরঙ্গ থিয়েটারের একটা ইতিহাস আমাদের বাঙলায় চলে আসছে। তার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের অভিনয়, নানা লোকনাট্য, কথকতা ইত্যাদির মধ্যে পাই। বাঙলাদেশে ইংরেজের সূত্রে থিয়েটারে যে পরিচয় ঘটলো সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু নতুন ব্যাপার আমরা জানতে পেরেছি। নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার সম্পর্কে জানা যায়, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় হ'তো 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটির।

এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাতায়াতের পথ ছিল সুড়ঙ্গ। আরো অনেক পরে বিশ শতকে এসে প্রসেনিয়াম মঞ্চ অনেক বেশি গতি পায়। রিভলভিং স্টেজ পাই আমরা বিভিন্ন থিয়েটারে। রিভলভিং স্টেজের একটা সুবিধা হল দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে তিন চারটি দৃশ্য তৈরি হয়ে থাকে, যখন যে দৃশ্যটি প্রয়োজন পড়ে তখন সেটি খুব দ্রুত উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। সারকারিনা মঞ্চ অবশ্যই একটি নতুন ধরনের থিয়েটার ব্যবস্থা। সেখানে নিচ থেকে উপরে উঠে আসে স্টেজ। এবং সার্কাসের মতন চারদিকে দর্শকরা থাকেন। দর্শকদের মাঝখান থেকেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে পৌঁছন। সরকারিনার প্রতিষ্ঠাতা অমর ঘোষ ব্যক্তিগত আলাপে জানিয়েছেন, এই ধরনের মঞ্চে অভিনয় করার জন্য বিশেষ অভ্যাস দরকার হয়। বিশেষ দক্ষতা না থাকলে এই মঞ্চে অভিনয় করা সম্ভব নয়, তাই অমর ঘোষের প্রয়াণের পর ফলে নাট্যমঞ্চটি আর কারো হাতে সজীব রইলো না। সুতরাং নাটককে নাট্যে রূপান্তর করব ভাবলেই হয় না, মঞ্চকে ব্যবহার করতে জানতে হয়।

বাঙলায় ভালো মঞ্চ নেই বললেই চলে, হাতেগোনা কয়েকটি। কিন্তু সব নাট্যদল মঞ্চগুলিতে ঠাঁই পায় না। একাডেমি রবীন্দ্রসদন শিশিরমঞ্চ গিরিশ মঞ্চ এর বাইরে ভালো নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থা কলকাতায় দুর্লভ। জেলাগুলিতে রবীন্দ্রভবন নামক এক ধরনের মঞ্চের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ ও যত্নের অভাবে এত নিম্নমানের হয়ে উঠছে যে সেখানে প্রযোজনা করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এমনও ঘটনা দেখা যায়, মঞ্চের অসুবিধার কারণে পূর্ব নির্ধারিত মঞ্চপরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে কখনো কখনো। লাইট লাগানোর সমস্যা থেকে শুরু করে নানা জাতীয় প্রতিবন্ধকতা মঞ্চগুলিতে থাকে। তবু তো মঞ্চকে ব্যবহার করে ভালো নাট্যের সন্ধান আমরা পাই, সফল সুন্দর নাট্য উপহার দিয়েছে বহু নাট্যদল। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত 'শেষরক্ষা' নাটকের প্রযোজনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি দর্শক আসনকেও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এক নতুন ভাবনার সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীতে লিটিল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত উৎপল দত্ত পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' মঞ্চকে নতুনভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়ে যায় আমাদের। গন্ধর্ব পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১৯৬৩ সাল) অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় লেখেন "পিকচার ফ্রেম থেকে নাট্যশিল্পকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা এবং চতুর্থ দেওয়ালকে অস্বীকার করে মঞ্চকে দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে তাঁদের অভিনীত নাটকের অংশীদার করে তোলার প্রচেষ্টা এদেশেও আগে হয়েছে কিন্তু তাতে মঞ্চস্থাপত্যের ভূমিকা অনুপস্থিত ছিল। আলোচ্য নাটকটির

ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা উপস্থিত।" নান্দীকার প্রযোজিত 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' প্রযোজনায় সুন্দর ভাবে স্থাপত্যকে ব্যবহার করে মঞ্চকে দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

(৪)

নাট্যকলার আর একটি উপকরণ আলো। পথনাট্য দিনের আলো ও রাতে হ'লে পথবাতির আলোতেই অভিনয় সম্পন্ন হয়। অন্তরঙ্গ থিয়েটারে সাধারণ আলোকেই নানা শেডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে কৃত্রিম উপায়ে আগুনের দ্বারা আলো ব্যবহার করা হ'ত। মশাল ও প্রদীপ সেই আলোর উৎস ছিল। মঞ্চের সামনে প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে নাট্যাভিনয় হ'ত বলে আজও "পাদপ্রদীপের আলো" কথাই প্রসেনিয়াম মঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা পাই। পরবর্তীতে অবশ্য আলোর নানা কারুকার্য শুরু হয়। কেবল উপকরণ নয়, আলো একটি চরিত্র হয়ে ওঠে নাট্যের ক্ষেত্রে। ভোর দুপুর সন্ধ্যা রাত ইত্যাদি বোঝাতে যেমন আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তেমনি জোনাল অ্যাক্টিং ফ্ল্যাশব্যাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলোর সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবার চরিত্রের নানা কর্মকাণ্ডকে অর্থবহ করে তোলবার জন্য আলোর ব্যবহার হয়। আলোপ্রক্ষেপণ একটি চরিত্র বা ঘটনার অর্থ উদ্ভাসিতও করে তোলে। সতু সেন আলোর ব্যবহার করে বাঙলা নাট্যজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাপস সেন কনিষ্ক সেন প্রমুখ নাট্যে আলোর বিপ্লব নিয়ে আসেন।

(৫)

কোনো কোনো পরিচালক মিউজিক বেশি দিতে পছন্দ করেন, কোনো পরিচালক এই ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত। আবহসঙ্গীত বলতে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত উভয়কেই বোঝায়। বাঙালি গীতিপ্রাণ জাতি। তার শিরায় শিরায় সঙ্গীতমূর্ছনা। ফলে বাঙলা নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবহমানকাল ধরে বাঙলা লোকনাট্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য। কথকতাগুলিও সঙ্গীতের আকারে পরিবেশন করা হ'ত। বাঙলায় নাটক তো আসলে পালাগান। যাত্রার ক্ষেত্রেও সকলের যাত্রা শুনতে যান, দেখতে যাওয়ার পরিবর্তে। পরবর্তীতে কালে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নাটককার সেলিম আল দীন জাতীয় নাট্যধারা নামক যে ভাবনার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, সেখানে সংগীতের আকারে কথকতার ধর্মে নাট্য পরিবেশিত হয়েছে।

সঙ্গীতের ব্যবহার নাট্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে। কোনো কোনো সঙ্গীত নির্দিষ্ট নাট্যটির বাইরেও বেশ প্রভাব ফেলে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'নরকগুলজার' নাটকের বিখ্যাত গান 'কেউ কথা বোলনা কেউ শব্দ কোর না/ ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন...'। এই ধরনের বহু নাট্যের গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার ঘটনার অগ্রগতির জন্য, চরিত্রের অন্তর উন্মোচনের ক্ষেত্রে ও ড্রামাটিক রিলিফের প্রয়োজনে হয়েছে। এক সময় নাট্যে বিবেকের অবতারণা ছিল খুব বেশি। বিবেক চরিত্রটি গানের মধ্য দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা যেমন করত, তেমনি চরিত্রগুলির ভিতরের কথাকেও বাইরে প্রকাশ করবার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল বিবেকের সঙ্গীত।

যন্ত্রসঙ্গীত বলতে একদা ঢোল হারমোনিয়াম, খোল, বাঁশি, তবলা, খঞ্জনি ও পার্কাসনের ব্যবহার বেশি ছিল। পরবর্তীতে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার ক'রে নাটকে শব্দপ্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কোনো কোনো নাটকে অবশ্য মঞ্চের মধ্যেই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আধুনিক প্রযুক্তির জন্য ল্যাপটপে সাউন্ড সিস্টেমকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে শব্দপক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

(৬)

একটি চরিত্রকে চেনা যায় তার সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে। যদিও অঙ্গন মঞ্চের নাট্য বা থার্ড থিয়েটার ফর্মের নাট্যের কোনো কোনো প্রযোজনায় দেখা গেছে একই ধরনের পোশাকে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। সেখানে একই শিল্পি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন বলেই পোশাক-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু প্রথাগত নাট্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা ভাবে সজ্জিত হয়েই মঞ্চে উপস্থিত হয়। এক সময় পোশাক নিয়ে কোন যত্নশীল মনোভাব নাটদলগুলির প্রযোজনাতে দেখা যেত না। যার ফলে সিরাজদৌল্লার পোশাক অনায়াসেই শিবাজী পরে ফেলতে পারত। সার্বিকভাবে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রযোজনার ক্ষেত্রে পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হয়ে উঠেছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে পোশাক ব্যবহার করে। সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে তাঁরাও নির্ভরযোগ্য

ভাবনার পরিচয় রাখেন। নাট্যের চরিত্র ঘটনা স্থান এবং কাল অনুযায়ী পোশাক ব্যবহারের দিকে নজর দিয়েছিলেন তাঁরা।

চরিত্রের সাজসজ্জা নিয়ে আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, কখনো কখনো একটি নাটকের দ্বৈত চরিত্রের কারণে কিম্বা ফ্লাশ ব্যাকের কারণে শিল্পিকে বারবার পোশাক বদল করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সহজে বদলানো যায় এমন পোশাক শিল্পির জন্য নির্বাচন করা দরকার। পোশাক পরিবর্তনের সময় যেন বেশি না হয়। হলে দর্শকদের একঘেয়ে লাগতে পারে। মনে পড়ে মানিকতলা অক্ষ নাট্যদলের 'জুজু' নাট্যে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয়কারী শিশু শিল্পী শ্রী ভোজ প্রথমে প্রবীণ জুজু এবং পরে কমবয়সী মা চরিত্রে অভিনয় করে। তাকে মা চরিত্রের জন্য আগে থেকেই শাড়ি পরানো থাকে, তার উপরে একটি কালো আলখাল্লা ধরনের পোশাক পরানো হয়, ফলে ভিতরের পোশাক দেখা যায় না। জুজুর মাথায় সাদা পরচুলা লাগানো হয়। কালো আলখাল্লা ও সাদা পরচুলায় তার মেকআপ মায়ের মেকআপের বিপরীত মেরুর হয়। সাদা পরচুলাটি খুলে মেয়েদের লম্বা কালো পরচুলা পড়াতে সময় লাগে ২০ সেকেন্ড, আর উপরের আলখাল্লা খুলতে সময় লাগে ১০ সেকেন্ড সব মিলিয়ে৩০-৪০ সেকেন্ডের মধ্যে দ্রুত পোশাক বদল হয়ে যায়। দর্শকদের একঘেয়েমি লাগেনা। এই ৪০ সেকেন্ড জুজুর সাঙ্গপাঙ্গরা খেলায় ভুলিয়ে রাখে দর্শকদের। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'সহানুভূতি' নাটকের অভিনয়ে অঙ্গসজ্জা শিল্পি সঞ্জয় পোদ্দার একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা করেন। নাটকটিতে আছে, মঞ্চের মধ্যেই এক চাকরিপ্রার্থী বেকার ছেলে চোখে অ্যাসিড ঢেলে তার একটি চোখ নষ্ট করে দেয়। সঞ্জয় পোদ্দার সেই শিল্পীর ব্যাগে একটি স্পঞ্জের তৈরি অ্যাসিডে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মতো একটি চোখ বানিয়ে গাম আঠা লাগিয়ে রেখে দেন। শিল্পি অ্যাসিড ঢালার সময় ওই চোখটি লাগিয়ে নেন তাঁর বাম চোখে, ফলে মঞ্চের মধ্যেই বীভৎস হয়ে ওঠে তাঁর চোখ। এক্ষেত্রে অবশ্য লাইটেরও একটা অবদান রয়েছে, রয়েছে শিল্পির বিশেষ দক্ষতা।

(৭)

এত কিছুর মেলবন্ধন যিনি ঘটন তিনিই তো নাট্যপরিচালক। এক সময় তাঁরা চিহ্নিত ছিলেন নাট্যশিক্ষক বা মাস্টার হিসেবে। তখন তাঁরা কেবল অভিনয় শেখাতেন। পরবর্তীতে সামগ্রিক ভাবনাকে নির্মাণ করবার প্রয়াসী হলেন যখন, তখনই তো তাঁরা হয়ে উঠলেন নাট্যপরিচালক, নাট্যনির্দেশক, নাট্যনির্মাতা বা প্রয়োগকর্তা। তাঁর ভাবনাতেই সম্পূর্ণ মালা গাঁথা সম্ভব হয়। যে যাঁর নিজস্ব দিক নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যখন তখন পরিচালক সামগ্রিকভাবে ভাবেন নাট্যটি নিয়ে। তিনি ঋষিতুল্য। সমগ্র নাট্যের চেহারা অনেক আগেই ভেবে রাখেন। যা আমরা দেখি তা সমস্ত শিল্পির সামগ্রিক দক্ষতায় নির্মিত হলেও স্রষ্টা সে-ই নাট্যপরিচালক। নানা স্তর পেরিয়ে ব্যর্থতার নানা ধাপ এড়িয়ে, যন্ত্রণার নানা পাঁপড়ি খুলে তিনি পৌঁছে যান সফল নাট্যে, যে নাট্য দেখার পর আমাদের মনে অনুরণন চলে একদিন নয়, দু'দিন নয়, বহুদিন পর্যন্ত!